গল্প

পাত্র চাই অর্গ্যানিক

মৈত্রেয়ী কুমার

লাউডন স্ট্রীটের এ মাথা থেকে ও মাথা চষে ফেললো ধৈর্য্যসম। কোথায় ফিউটাইল ভার্সেস ফার্টাইল প্যাথোলজি সেণ্টার? যে রকম পথনির্দেশ দেওয়া ছিল, বরাবর তাই এসেছে ধৈর্য্য। এই তো, বড় রাস্তার একেবারে ওপরেই ডাঃ সুন্দরলাল ত্রিপাঠীর কসমেটিক সার্জারি ক্লিনিক। নেমপ্লেটের পাশে বিজ্ঞাপনী সাইনবোর্ড। 'এখানে পুরুষদের ঝোলা ব্রেস্ট টাইট করা হয়।' 'মহিলাদের দাড়ি গোঁফ স্থায়ী ভাবে উৎপাটন এবং শরীরের বাড়তি মেদ ঝরানো হয়।' তার পাশে এটা আবার কি! বন্ধ নীল দরজায় সবজেটে সাইনবোর্ডে বাঁকা হয়ে ঝুলছে হরফ ক'টি —'নেভা আগুন দাউ দাউ জ্বলবে। পরীক্ষা বিচার্য।' দমকলের অফিস-টফিস না কি? নাহ্, চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে ধৈর্য্য। দমকলের কাজ তো দাউ দাউ আগুন নেভানো। 'হুমম, এ আগুন নিভলে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি।' নিজের মনেই হাসল ধৈর্য্য।

পেরিয়ে গেল জুস্ কর্নার, বৃহন্নলা বিউটি পার্লার। এ পাড়ার সব দোকানগুলোই নামের বাহার আর বিজ্ঞাপনী চমকে অভিনব। বৃহন্নলা নামে আকৃষ্ট হয়ে ভালো করে ঘাড় ঘুরিয়ে পার্লারের পাশে এঁদো গলি পথে তাকাতেই চোখে পড়ে গেল ফার্টিলাইজেশনের ক্লিনিকটা। ত্রস্ত পায়ে গলিপথে এগোয় ধৈর্য্য। লঝঝড়ে মার্কা বিশেষত্বহীন ক্লিনিকটার দরজায় দাঁড়ায়। কোনো মানে হয়? অফিসের হাজার খানেক পেণ্ডিং ফাইলের গেরো, অথচ সে সব ছেড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে এই গলিপথে। ভাগ্যের চরম পরিহাস ছাড়া আর কি এসব!

বাড়িতেও বলিহারি। সদাগরি অফিসের চাকরিটা হওয়া মাত্র 'বিয়ে কর, বিয়ে কর' বলে কানের পোকা বের করে দিল। আসলে জানে, তার মতো গেরস্ত টাইপ ছেলে এ যুগের ট্যাটু-টুইটার প্রেমের জগতে কিছু করে খাবে এ অসম্ভব। তাই বাবা মা তো বটেই, জ্যাঠা মামা বাদে পাড়ার নাপিতটা পর্য্যন্ত অষ্টপ্রহর ঘটকালির ফলিত বিদ্যা ফলাচ্ছে তার উপর।

কথায় বলে লাখ কথায় পাকে বিয়ের ফল। কিন্তু এই দেড় বছরে লাখের উপর কথা চালাচালি হলেও ধৈর্য্যের বিয়ের ফল অঙ্কুরেই শুকোয়। পুরনো তত্ত্বতালাশ না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। হাল আমলের কথাই ধরা যাক। দিল্লী থেকে সম্বন্ধ পাঠাল বড় জ্যাঠা। মেহরৌলিতে জ্যাঠার বড় পাবলিশিং হাউস। ক' মাস যাবৎ এক ঝকঝকে চেহারার চকচকে ক্লায়েণ্টকে ভাইপো-বৌ হিসেবে বেশ মনে ধরেছে জ্যাঠার। তক্কে তক্কে থেকে ঠিক খবর পাওয়া গেল। মোনালিকার জন্ম কর্ম দিল্লীতেই। বাবা কাজ করেন মণ্ডি হাউসে। মেয়ে জে.এন. ইউ. থেকে হিউম্যান রিলেশনস্ নিয়ে সদ্য গবেষণা শেষ করেছে। নিজস্ব বই বের করবে, সেই সুত্রে পাবলিশিং হাউসে যাতায়াত। নিজস্ব চিন্তাধারা স্বাধীন মতামতের আধুনিক মেয়ে। জ্যাঠা ফোনে দরাজ হেসে ভাই বৌকে জানালেন, 'আমাদের ধীজুটা যা ক্যাবলাকান্ত, ওর জন্য এই রকম একটা পাওয়ারফুল মেয়ের নেহাতই জরুরত!'

এরপর দুই পক্ষই ফটো চালাচালি পর্বে উতরে গেল। পাত্র হিসেবে ধৈর্য্য মোটেও হেলাফেলার নয়। সুদর্শন, সরকারি চাকুরে, উত্তর কোলকাতায় নিজস্ব বাড়ি, পৈত্রিক সম্পত্তি। কলেজ স্ট্রীটে বাপের পারিবারিক পাবলিশিং ব্যবসা। মুম্বই আর দিল্লীর ব্যবসা দেখেন মেজো জ্যাঠা আর বড় জ্যাঠা। মা আক্ষরিক অর্থেই গৃহবধূ। ছোট থেকেই ধৈর্য্য এক নিটোল মধ্যবিত্ত গেরস্ত আবহাওয়াতেই বড় হয়েছে। বাহারি শখ ফুটানি চাল কিছু নেই। চাহিদা উচ্চাশাও আকাশছোঁয়া নয়। কারিগরী দক্ষতা বলতে অফিসের কাজে যেটুকু কম্প্যুটারী বিদ্যে লাগে, সেটুকুই। অবসর সময়ে এখনো তার প্রিয় গান আরতি, সন্ধ্যা, হেমন্ত, পঞ্চম। পড়ার নেশায় আছেন বিভুতিভূষণ, তারাশংকর, বনফুল। গাছগাছালির শখ আছে কিছু। প্রায়ই অফিস ফেরত শেয়ালদা মোড় থেকে সস্তা দরে কেনে বেল, মালতী, জুঁই ফুলের চারা। যত্নে লাগায় সীম, টমেটো, লঙ্কার গাছ। লতানো উচ্ছে গাছে ছোট ছোট কলকের মতন ঘন সবুজ উচ্ছে ফললে তার আনন্দ দেখে কে!

মোনালিকার সঙ্গে ফটো চালাচালি সেশনের পর প্রায় পক্ষকাল উতরে গেছে। একদিন লাঞ্চ আওয়ারে পার্সোনাল মেল চেক করতে গিয়ে ধৈর্য্য দেখে তাকে লেখা মোনালিকার এক বার্তা। জীবনে প্রথম কোন মেয়ের কাছ থেকে চিঠি। অধীর আগ্রহে ই-মেলে ক্লিক করে যে চিচিং ফাঁকটি বেরোল তা পড়ে তো ধৈর্য্যের চক্ষু চড়কগাছ ! বাংলা ইংরিজি মেশানো বয়ানটি ঠিক এইরকম: 'হাই, আমার ফ্যামিলির সবারই আপনাকে মোটামুটি পছন্দ। এরপর হয়তো ডেটও ফাইনালাইজ্ হয়ে যাবে। কিন্তু আলটিমেটলি জীবনটা যখন আমার তখন কয়েকটা ব্যাপারে আপনাকে ক্লিয়ারলি লিখছি, আশাকরি ভুল বুঝবেন না।'

এই পর্য্যন্ত পড়েই ধৈর্য্যের স্নায়ু টানটান। 'এই রে, এর বোধহয় পুরনো প্রেমিক ট্রেমিল আছে,' ভাবলো ধৈর্য্য। হাতের গোড়াতেই জলের বোতল। কিছু গলা ভিজিয়ে আবার মাউস স্ক্রোল করে পড়তে থাকে: 'আই রিয়েলী অ্যাডোর মাই জব। পাততাড়ি গুটিয়ে কোলকাতায় শাদী করা আর ধাঁ করে মা হওয়া, ইটস্ নট মাই কাপ্ অফ টী। সেক্ষেত্রে যদি আপনি দিল্লী আসা কনসিডার করেন দ্যাট উইল বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। এবার কিছু ইনটেন্সিভ কথা। সেক্স নিয়ে আমার তেমন কোন ট্যাবু নেই। গুড সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সেস্ বুঝতে পারে ক'জন? আই মীন, ভারতীয় পুরুষদের সেক্সুয়াল অ্যাটিচিউডটা মহিলাদের প্রতি রীতিমতো ডিসরেসপেক্টফুল! উই ডোণ্ট নো হাউ টু এক্সপ্লোর ইচ্ আদার। আমরা মেয়েরা, উই আর নো টুলস! আমি ফ্যানাটিক ফেমিনিস্ট নই, যদিও ফ্যান্টাবুলাস ফেমিনিন মনের মানুষ। আমি বিলিভ করি রিলেশনশিপ দাঁড়িয়ে থাকে একটা হেলদি কম্পাটিবল সেক্সুয়ালিটির উপর। তাই, আপনি দিল্লী আসুন। আমরা নিজেদের একটু জেনে বুঝে নিই। তারপর না হয় ডিসাইড করবো ফারদার এগুনোর? ট্রুথফুলি আপনাকে খোলা চিঠি দিলাম। নাও বল্ ইজ ইন্ ইয়োর কোর্ট।'

বারকয়েক চিঠির বয়ানটা পড়ল ধৈর্য্য। বুকে বসন্তের বাতাসের বদলে কেমন যেন ভাদুরে দম চাপা ভাব। কি উত্তর লিখবে সে এখন? দেখতে গেলে মেয়েটা তেমন ভুল কিছু বলেনি, কিন্তু বড্ড চাঁছাছোলা, কাছাখোলা। চাঁদ ফুল জোছনার প্রেমকে এ যেন এক চড়ে ঝলসানো রুটি বানিয়ে ছেড়েছে। দিল্লী না গিয়ে ডাকবে নাকি মেয়েটাকে ক'দিনের জন্য কোলকাতা দেখার আমন্ত্রণে, কিছু দেখা কিছু চেনার পালায় যদি বাঁধা পড়ে উন্মনা মন। নির্জন হলুদ দুপুরে চঞ্চল চড়াই-এর মতো জোড়ে গঙ্গাঁর হাওয়ায় একটু না হয় ওড়াওড়ি, ঘন মহীরূহের সবুজ ছায়ায় নতুন পাটভাঙা শাড়ির মতো আলগোছা কিছু ভালোবাসাবাসি। পরক্ষণেই চোখে ভেসে ওঠে চিঠির বয়ান। সেখানে কোথাও তো ছড়ানো নেই প্রেমের দু চারটে মুকুল, বরং যেন সেক্সুয়াল কম্পাটিবিলিটির ওপর ঝাড়া এক খটমটে নোট। নোট পড়ে এ যেন জয়েণ্ট ম্যারেজ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বসা, ফেল হলে চিরদিনের জন্য হাতে-রইলো-পেন্সিল টাইপ জীবন।

সারি সারি কিউবিকলে ঠাসা অফিসটাকে জেলখানা মনে হতে লাগল ধৈর্য্যর। একটু নির্মল বাতাস পাওয়ার জো নেই। পাশের করিডরে তু রু রু শিষ দিতে দিতে পার হচ্ছে সিদ্ধার্থ। সপ্তাহ দুয়েক আগে বিয়ে করে ব্যাটার আঙুল ফুলে কলাগাছ। কানা ঘুঁষোয় শোনা শ্বশুর বাড়ি থেকে ঝেঁপেছে বিস্তর। দেঁতো হেসে সবাইকে বলে 'নতুন বাবা-মার ভালোবাসার আশীর্বাদ, ফেলা যায়?' সোনার ডিম পাড়া বৌকে তোয়াজে রাখতে রোজই অফিস ফেরত বুকে ফুলের তোড়া না হয় বগলে চকোলেটের বাক্স চেপে বাড়ি ফেরে। ভালোবাসার এই দেখনদারিতে মনে মনে বেশ গর্বও আছে। চলা ফেরায় আছে একটা মাতব্বরি চাল। দু একবার করুণার হাসি ফুটিয়ে ধৈর্য্যকে বলেছে, 'ব্রাদার! ডেস্কের ফাইলে সিঙ্ক করলে লভ্-এর পানসীতে সেইল করা যায় না। জানো তো রবিদাদু বলে গেছেন প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। তা তুমি বস্ এতো হুঁশিয়ারি হলে ফাঁদগুলোকে তো মিস্ করবেই।' বলেই উল্টো দিকের কিউবিকলে বসা ফিনান্সের পারমিতার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকেছিল।

নাহ, চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ভাবে ধৈর্য্য। অফিসে কারো সঙ্গেই এই গুরুত্বপূর্ণ ই-মেলের ব্যাপারে আলাপ করা যাবে না। শুভাকাঙ্ক্ষী নয় কেউই, উল্টে গসিপের ভালো মেটিরিয়াল পেয়ে ছোঁক ছোঁক করবে।

হুঃ, পারমিতাদের গ্রুপটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে ধৈর্য্য। ওদের গ্রুপের লিডার তো ওই চন্দনা! বাপস্! মেয়ের খোলসে যেন এক জাঁদরেল জেনারাল। সিদ্ধার্থদের মুখেই শোনা, দুটো বিয়ে মহিলার। প্রথম বকরা ছিল অতনু নামের এক ছোকরা। নতুন জয়েন করেছিল ওদের ডিপার্টমেন্টে। ওই রবিবাবুর পাতা প্রেমের ফাঁদে বেমক্কা পা ফেলে শেষে বেচারার কি অবস্থা। রীতিমতো হাউস হাজব্যাণ্ড করে রেখেছিলো ওকে চন্দনা। একসাথে দাঁত কেলিয়ে দুজনে অফিসে ঢুকতো বটে সকালে কিন্তু বেশ টের পাওয়া যেত সম্পর্কের নীচের স্রোত কোন খাতে বইছে। বেলা একটা বাজলেই মহারাণীর হাতে হোম মেড টিফিন। তাতে তড়কা নুন ঝাল কম হলে সবার সামনেই 'অতনু বধ' পালার ডায়লগ। একবার নাকি ডলি-সিদ্ধার্থ-পার্থরা রবিবারের সন্ধ্যা আড্ডায় ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে অতনু তনুভরা নোংরা কাপড় জামা নিয়ে চলেছে সাবান ভেজাতে। বন্ধুদের দেখে চন্দনার সে কি গজগজ! 'সকাল থেকে বলছি আজ তোরা আসবি, তা হাতে পায়ে যেন বাত। একটু কি রান্না করেছে আর ঘর পরিষ্কার করে কাপড় কাচতেই বেলা ভোগে গেল।'

বছর ঘোরার আগেই অতনু কোলকাতা ছেড়ে হাওয়া। সিদ্ধার্থরা বলাবলি করে ডিভোর্স ফাইল করার পর থেকে অতনুকে একেবারে যমযন্ত্রণা দিয়ে ছেড়েছিল চন্দনা। অতনুর নামে মিথ্যে রটনা বদনাম তো বটেই, কোর্টে নাকি অতনুর ডান চোখটা কালশিটে পড়া ফোলা ছিল। যদিও পৌরুষের আঁতে অতনু বলেছিল ওটা ধাক্কা লাগার ফল, কিন্তু গোটা অফিস এই এখনো পর্য্যন্ত চন্দনাকে রেগে গিয়ে টেবিলে ঘুঁষি মেরে কথা বলতে শুনলে নিরীহ ভাবে বলে, 'আহা, ওটা অতনুর থোবড়া নয়, হাতে লাগবে যে!'

চন্দনার কপালগুণে তার দ্বিতীয় স্বামীটাও বেশ গোবেচারা। মাঝে মাঝে ছুটির পর ভদ্রলোককে দেখেছে ধৈর্য্য। অফিসের মেন গেটে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন রায়বাঘিনী গিন্নীর জন্য। চন্দনা কখনোই আর কোলিগদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় না, তাই তার গেরস্থালীর খাঁচায় এই ভদ্রলোক কোন ক্যাটাগরীর সাজা ভোগে তা নিয়ে অফিসে বিস্তর জলঘোলা হয় আড়ালে আবডালে।

এই প্রমীলা গ্রুপের ধারণা ধৈর্য্যর বিয়ে হয় না কারণ সে আদতেই একটি নির্বোধ অহংকারী। সে এতটাই নাক উঁচু যে পারমিতার মতো মেয়েকেও তার মনে ধরে না বা চোখেও পড়ে না। আসলে ধৈর্য্য মেয়েদের ব্যাপারে এমনিতেই একটু জড়সড়। তার উপর অফিসের প্রমীলা মহলের ব্যাপারে সে একটু বাড়তি সচেতন। তার স্থির বিশ্বাস হোমফ্রন্ট আর ওয়ার্কফ্রন্ট এক হওয়া একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। কোন ফ্রন্টেই যদি প্রাইভেসী না থাকে তো মানুষ স্বস্তি পায় কি করে! আরে সব সম্পর্কেই মাখন গলে গেলে থাকে তো সেই দোষারোপের চর্বিত চর্বন। চারপাশে দেখছে তো!

'কি বাচ্চু, সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ভদকা?' বলে হো হো হেসে পাশ কাটায় সিদ্ধার্থ। যেন কি এক মশকরা করে দিল। বিরক্তি চেপে মোনালিকার মেলের উত্তর লেখে ধৈর্য্য।

এমন নয় যে সে মেয়েদের খারিজ করার জন্যই বসে আছে। তার কপালে যোগাযোগগুলোই আসে খাসা। কাছেই এই নকুড় মিস্ত্রী লেন থেকে যেমন এসেছিল নমিতা বিষয়ী। সম্বন্ধ এনেছিল মামাতো জামাইবাবু। পাত্রীর দাদা এলআইসীর উচ্চ চাকুরে। জামাইবাবু ওনার দামী ক্লায়েন্ট। পাত্রীর ইচ্ছে অনুযায়ী দেখা সাক্ষাত প্রথমে হবে শুধু পাত্র পাত্রীতে। ভেন্যু বাগবাজারের মোড়ে 'ডোণ্ট কুক - জাস্ট ইট' ক্যাফেতে। ছিমছাম মিস্ বিষয়ীকে নিয়ে মনের জানলা খুলে সবে একটু ভালোভাবে উঁকি দিতে গেছে ধৈর্য্য, দেখে মিস্ বিষয়ীর তাতে কোন চিত্তবৈকল্য নেই। অর্ডার দেওয়া চিকেন স্যাণ্ডউইচে কামড় বসিয়ে সে তখন ভারি উৎসুক ধৈর্য্যের মাস মাইনে, বছরের অ্যালাওয়েন্স, ইন্সিওরেন্স পলিসি, ধার দেনা, সেভিংস, প্রিমিয়ম ইত্যাদির তথ্য নিষ্কাষণে। কিছু পরে ধৈর্য্যের মনে হল সে যেন দুঁদে এক ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসারের সামনে বসে আছে। লাভের মধ্যে মিস্ বিষয়ীর সঙ্গে আলোচনায় বিয়ের ফুল ফুটুক না ফুটুক নিজের ফাইনানশিয়াল স্ট্রাটেজিটা বেশ জলবৎ তরলং হয়ে গেল মগজে। বিষয়ীর বিষয়ে ওখানেই ইতি।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ছেলের তরফে কোন সাড়া নেই। ওদিকে দিল্লী থেকে বড় ভাসুর ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছে। এক সকালে অফিসে বেরোবার মুখেই ধৈর্য্যকে পাকড়াও করল ওর মা। 'হ্যাঁ রে, শুধু শুধু মেয়েটাকে ঝুলিয়ে রেখেছিস কেন?'

দুম করে একটা কথা শুরু করা মায়ের চিরকালের অভ্যেস। অফিসে বেরোবার তাড়া থাকে এইসময়, বুঝবে না। পকেটে পার্স পুরতে পুরতে ধৈর্য্য বলে, 'কোন মেয়েকে কোথায় ঝুলোলাম ?'

লাগোয়া উঠোনের কোনায় একটা ছোট চৌবাচ্চায় চারা চারা ছোট মাছ ছেড়ে রেখেছে ধৈর্য্যের বাবা। মাছগুলোকে আটার গুলি খাওয়ানো ওনার নিত্যকর্মের একটা। লুঙিটাকে কষে পেট ও বুকের সন্ধিস্থলে বেঁধে তিনি তখন ঐ কাজটাই করছিলেন। ওখান থেকেই হাঁকলেন, 'তোমার মা কোন সার্কাসের ট্র্যাপিজের খেলা মীন্ করছে না। বলা হচ্ছে দিল্লী থেকে বড়দা যে মেয়েটির তত্ত্ব তালাশ পাঠালো, তার কি গতি তুমি করলে?'

লুঙিতে দু হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে বাবা। ততক্ষণে জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে নিয়েছে ধৈর্য্য। আলগোছে বাবার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মৃদু স্বরে বললো, 'ও আমার কলকাতার মেয়েই ভালো।'

'দেখলে?' বলে ধৈর্য্যের বাবার উপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল মা।

দিল্লীর মতো খানদানী জায়গার সম্বন্ধ এক কথায় নাকচ করে দেওয়াতে এবার আর আত্মীয় স্বজন ঘটকের উপর পুরো আস্থা না রেখে ধৈর্য্যের মা, বাবাকে দিয়ে ইংরিজি বাংলা কাগজে দেওয়ালো বিজ্ঞাপন। মাট্রিমোনিয়াল এজেন্সীগুলোতে শুরু হল তাঁক ঝাঁক। বিভিন্ন পোজের 'ইনা-মিনা-ডিকা'-রা ধৈর্য্যের ঘরের খাট বিছানা, টেবিল-চেয়ার দখল করল। সঙ্গে চলল সুযোগ পেলেই ছেলের কানে মার ফুসুর ফুসুর: 'অত

অধৈর্য্য হলে চলে বাবুন? সে দিন আর নেই যে পাত্র পক্ষের ইচ্ছে অনিচ্ছেই শেষ কথা। কোনকালেই এই বিয়ের পাকা দেখা কাজ সহজ ছিল না। এই যে তোর ঠাকুমা, আমায় সহজে কি ছাড়পত্র দিল? পুরো উঠোন চক্কর কাটিয়েছিল, হাঁটা দেখবে বলে। এক ঘর লোক, বলে "কাপড় তোলো," কি? না, পায়ের গোছ দেখবে ! লক্ষ্মীমন্ত পা কি না!'

ধৈর্য্যর হাই ওঠে। মা বলে চলে, 'তা বাদে শুক্তোতে কি ফোড়ন, পানের খিলি বানিয়ে দেখানো, আলতা পরাতে জানা আছে কি না, সেলাই ফোড়াঁই গেরস্থালির ঊনকোটি খবর। আবার দেনা-থোওয়া আলাদা। ভাব একবার!'

অলস গলায় বলে ধৈর্য্য, 'রাত হয়েছে, শুতে যাও মা। ভেবে কি হবে? সে রাবণও নেই, নেই সেই লঙ্কাও। এসব পুরনো কাসুন্দী ঘেঁটে কি লাভ!'

মার গলা ধরে আসে, 'এই অঘ্রাণে তোর বিয়ে আমি দেবই।' আশ্চর্য্য! মনে মনে হাসে ধৈর্য্য। তার মুখ দেখে মার কি মনে হচ্ছে ছেলেবেলায় চেয়েও না পাওয়া লেবঞ্জুসের জন্য কাঁদো কাঁদো হয়ে আছে ধৈর্য্য!

খবরের কাগজের সূত্রে অবশেষে এল একটি ইংরিজি ইস্কুলের শিক্ষিকার আবেদন। পিতা ডাক্তার, মা সমাজসেবী। বাসা ভবানীপুর। পালটি ঘর, বন্দোপাধ্যায়। দেরী না করে কন্যার ছবি চেয়ে উত্তর পাঠালেন পাত্রপক্ষ। ও পক্ষও বেশ তৎপর। মেয়ের ছবি দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল সকলের।

বহুদিন পর রাতের নিবিড় আঁধারে ধৈর্য্যের সামনে এলো রুবি রায়। রোদ জ্বলা হলুদ দুপুরে ২৪০ নং বাস থেকে নামলো। বাগবাজার বাস গুমটিতে দাঁড়িয়ে গলগল ঘামছে তখন ধৈর্য্য। রুবি রায় সামনে এসে গোড়ালির শাড়ি উঁচু করে তুলে ধরল। মিঠে সুরে বলল, 'এই বাস গুমটিটা পুরো ঘুরলেই হবে তো? পায়ের যা গোছ দেখার দেখে নাও।' ভয়ে লজ্জায় লাল হল ধৈর্য্য। টকটকে সুডৌল গোড়ালিতে বাঁধা রূপোর নুপুর সূর্য্যের আলোয় ঝিকঝিকে। পাছে রুবি রায় ভুল বোঝে তাই চোখদুটো সরানোর আপ্রাণ স্ট্রাগল করতে করতেই গালে টোকা — 'বাবুন, গাল বেঁকিয়ে গোঁ গোঁ করছিস কেন? অফিস যাবি না?' ধড়মড় জেগে বসে ধৈর্য্য। উফ! মা!! জাগাবার আর সময় পেল না!

আজ রবিবার। সকাল থেকেই জামা প্যান্টে ভদ্র ধৈর্য্যের বাবা। রান্নাঘরে মা ম্যাগাজিনি রেসিপি বিদ্যের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস আজ 'মুসু মুসু হাসি' মালপোয়া বাজিমাত করবেই।

দুপুর একটু ভরন্ত হতেই এসে গেল আকাঙ্খিত অতিথিরা। গাড়ি হাঁকিয়ে পাত্রী স্বয়ং বেদছন্দা। সঙ্গে বাবা, মা। সাবেকী রূপোর থালায় বাগবাজারের বিখ্যাত নদেরচাঁদের কাঁচাগোল্লা অতিথি আপ্যায়ণে লক্ষ তারার দ্যুতি ফুটিয়ে আছে। তার থেকে খান দুই মুখে পুরে পাত্রীর বাবা ভবানীবাবু বললেন, 'আমাদের মেয়ে সিম্পল লিভিং বাট হাই থিঙ্কিং-এর বিলিভার।' ধৈর্য্যের বাবা বাড়তি উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'কি রকম? কি রকম?'

উত্তর এল সমাজসেবিকা মা-র, 'ওর লাইফ স্টাইলটা খুব অর্গ্যানিক।' মানে বুঝতে না পেরে ধৈর্য্যের মা স্বামীর মুখে উত্তর খুঁজতে লাগলেন। বেদছন্দা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। ধৈর্য্য অপলক দেখছিল স্বপ্নের রুবি রায়কে। হঠাৎ মনে হল, এঃ হেঃ, লজ্জা পেয়ে বেচারী নদেরচাঁদের কাঁচাগোল্লা মিস্ করে যাচ্ছে। সে থালাটা বেদছন্দার মুখের সামনে ধরে বলল, 'হেল্প ইওরসেল্ফ! ইটস্ রিয়েলী ডিভাইন!' পাশ থেকে কাঁচাগোল্লা আলতো তুলে নিলেন ভবানীবাবুর স্ত্রী। বেদছন্দা কিন্তু হাত গুটিয়েই থাকল। ধৈর্য্য আহত গলায় বলল, 'আপনি নেবেন না?'

বেদছন্দার দীঘল চোখ যেন কপোতাক্ষ নদ! ডুবলে ভেসে ওঠা দায়! ধৈর্য্যের ঘোর ঘোর ভাবের ছানা কেটে গেল তীক্ষ্ম গলার তেঁতুলি প্রশ্নে, 'আপনি বুঝি জাঙ্ক ফুড খাওয়া খুব পছন্দ করেন?'

বলে কী! গোটা উত্তর কোলকাতা যাদের ব্রাণ্ডের কাঁচাগোল্লার সম্মানে হট্ স্যাল্যুট্ দেয় তাদের প্রোডাক্ট কি না জাঙ্ক্ ফুড!

তুম্বোমুখে রান্নাঘরে খাবারের সঙ্গে মেজাজ গরম হতে লাগল ধৈর্য্যের মা'র। মনে মনে ভীষণ বিরক্ত। যতো সব দক্ষিণী কলকত্তাইয়া দেমাক। চিরকাল জেনে এসেছেন পাত্র যায় পাত্রীর বাড়ি পাকা দেখা করতে। ইনি বাঁধলেন উল্টো তানে সুর। এখন ঢং দেখে বাঁচি না। তখন থেকে যে আহ্লাদ! এই মেয়ে খুন্তি-টুন্তি ধরতে পারে তো?

ডাইনিং টেবিলে 'চিকেনের স্কাইস্ক্র্যাপার' আর 'মাটনের ডাকবাংলো' পদ দুটো সাবধানে নামিয়ে বেদছন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন ধৈর্য্যের মা, 'জানি, তোমরা সব আজকালকার ব্যস্ত মেয়ে, তবু পালে পার্বনে অবরে সবরে রাঁধতে তো পারো?'

বেদছন্দা বলল, ‘আমাদের সব রান্নাই জিরো ক্যালোরির ফুড রেসিপিতে মাইক্রোওভেনে হয়। সময় লাগে দশ মিনিট।’

‘অ,’ বলে রান্নাঘরে ভ্যানিশ হ’ন ধৈর্য্যের মা।

বিকেল হয়ে এল। এবার উঠবেন পাত্রীপক্ষ। ধৈর্য্যের বাবা ভবানীবাবুকে কিছু জোরাজুরি করেছিলেন বটে বিকেলের চা-এর সঙ্গে পাড়ার কালুর দোকানের গরমাগরম আলুবড়া, ফুলুরি খেয়ে যেতে, যা খেলে ওঁদের নাকি ‘আবার খাবো’ বলে আসতেই হবে। বাধ সাধলো মেয়ে। তাদের নাকি স্ট্রীট ফুড ওরিয়েন্টেড লাইফস্টাইল নয়। অতএব মুখে কুলুপ ধৈর্য্যের বাবারও।

অতিথিকুল পাখির আহার সারলেও ধৈর্য্যের বাবার দুপুরের কবজি ডোবানো আহারটি মন্দ হয়নি। বহুক্ষণ যাবৎ তাঁর একটু বিড়ি টানবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু খাপ খোলা অরগ্যানিক তলোয়ার হাতে, থুড়ি, মুখে নিয়ে যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীবাঈটি বসে আছেন সামনে, তাতে বিড়ির কথা ভাবতেই ভয় হয়, ধরানো তো দূর!

তার চেয়ে এই বেলা ছেলে যদি নিভৃতে মেয়েকে কিছু কথা টথা বলতে চায় তার উদ্যোগ নেওয়া ভালো, ভেবে বলতেই যাচ্ছিলেন যে চাইলে ওরা ছাদে বা উঠোনে বেড়াতে পারে, তার আগেই মিস্ লক্ষ্মীবাঈ ছেলেকে বলে উঠলো, ‘ধৈর্য্যবাবু, আপনি কি স্মোক বা ড্রিঙ্ক করেন?’

সেরেছে, কম্ম কাবার! প্রশ্ন শুনে তটস্থ হন ধৈর্য্যের বাবা। তাঁর আবার ওই দুটোই একটু আধটু চলে কি না! ধৈর্য্য কিন্তু সহজ গলায় বলে উঠল, ‘না। কেন জিজ্ঞেস করলেন?’

বেদছন্দা ধৈর্য্যের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, ‘আমি একটু গ্রীন্ টি পেতে পারি?’ এই প্রথম তার মুখে স্মিত হাসির রেখা। তাইতেই ধৈর্য্যের মনে হাজার আশার ঝাড়বাতির আলো। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘স্যরি, গ্রীন টি তো নেই, তবে লেবু চা হতে পারে। আমি ভালো বানাই।’ বেদছন্দা মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

‘লেবু চায়ের ফ্রেশনেশের তুলনা নেই। আঃ,’ বলে লক্ষ্মীবাঈকে আড়ে আড়ে দেখে তৃপ্তিভরে চা-এ চুমুক দিলেন ধৈর্য্যের বাবা। বেড়ে বানিয়েছে যা হোক খোকা। চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশংসার চোখে ধৈর্য্যের দিকে তাকাল বেদছন্দা। ওফ্! সেই দৃষ্টিতে কী নেই। চন্দনরঙা ওই মুখে ঝুরো ঝুরো কালো চুলের রাশি। ওই সুগৌর হাতের রিনঠিন সোনাঝরা চুড়ির মিঠে বোল। ওই চুলে মুখ ডুবিয়ে, ওই হাতে হাত রেখেই তো অনন্তকাল কাটিয়ে দিতে পারে ধৈর্য্য। আহা, জীবন যেন একমুঠো তাজা অরগ্যানিক ঘাসফুল! সেখানে নাই বা থাকল নদেরচাঁদের কাঁচাগোল্লা, কালুর হাতের মোচার চপ, মায়ের হাতের নরম গোলাপি কাঁকড়ার রগরগে লাল ঝোল!

‘শুনছেন ?’

আবার ঘোর কাটে ধৈর্য্যের। ‘আ...আমাকে বলছেন?’

‘অবশ্যই। বলছি দেরী না করে কাল সকালেই তাহলে ব্লাড টেস্ট্গুলো করে নিন।’

‘সে কি, কেন?’ আঁতকে ওঠে ধৈর্য্য। ‘আমি তো বিন্দাস্ আছি!’

চা শেষ করে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ায় বেদছন্দা। বাবা মার দিকে ফিরে বলে, ‘এবার ওঠা যাক!’ সবাই এগিয়ে চলে সদর দরজার দিকে। গাড়ির চালকের আসনের দরজা খুলে বলে, ‘হাউ ফার ডু আই নো ইউ? লাউডন স্ট্রীটে বাপির একটা প্যাথোলজি সেণ্টার আছে। সেখানে বলা থাকবে। একটা রুটিন কালচার, থাইরয়েড, হেপাটাইটিস্ বী, আর এইচআইভির টেস্টগুলো করিয়ে নিন। রিপোর্ট ঠিকঠাক আসুক!’

ধৈর্য্যের মার চোখ ততক্ষণে ছানাবড়া। পাকা দেখতে এসে তার ছেলেকে খামোখা এতগুলো ডাক্তারি পরীক্ষা কেন করতে হবে ভেবে না পেয়ে ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণসুরে বললেন, ‘এ কি ব্যাপার সব! আজ তাহলে এখেনে কী হল?’

বেদছন্দা এবার হেসে বলল, ‘এটা কাঁচা দেখে গেলাম। রিপোর্টে পাকা দেখা হবে। আসি?’

প্যাথোলজি ক্লিনিকের ভেতরে রাজ্যের ব্যস্ততা। হরেক কিসিমের মানুষের হরেক রকম দায়বদ্ধতার অনুসন্ধিৎসা। শুধু ধৈর্য্যের দায়টা একেবারেই অন্যরকম। নব্য আধুনিকতার ম্যাও সামলানো কি চাট্টিখানি কথা!

— সমাপ্ত —

আমার লেখা ই-মেলে পাওয়ার জন্য বং ঢং ডট কম-এ সাইন আপ করুন